‡UKmB Dbqb Afxó (GmwWwR)-Gi Av‡jv‡K evsjv‡`‡k `wjZ Rb‡Mvôxi Ae¯vb

wimvP Bwbwk‡qwUfm, evsjv‡`k

"‡UKmB Dbqb Afxó (GmwWwR)-Gi Av‡jv‡K evsjv‡`‡k `wjZ Rb‡Mvôxi Ae¯vb"
শীর্ষক সংলাপে উপস্থাপিত

12 b‡f¤i 2017, XvKv

<u>Av‡qvR‡b</u>

1. ‡UKmB Dbqb Afxó (Sustainable Development Goal- SDG)

1.1 cUfwg

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) (Sustainable Development Goal- SDG) হচ্ছে জাতিসংঘ প্রদত্ত নতুন কিছু লক্ষ্যমাত্রা ও নির্দেশক যা কিনা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আগামী ১৫ বছরে তাদের নিজ নিজ উন্নয়ন কর্মসূচীতে গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০০০ সনে ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goal- MDG)-র ধারাবাহিকতা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন কাল ধরা হয়েছিল ২০০০-২০১৫। এর ৮টি লক্ষ্য ছিল[১] ঃ

১) চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা, ২) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩) জে-ার সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন, ৪) শিশু মৃত্যুহার কমানো, ৫) মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬) এইচআইভি, এইড্স, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ-ব্যাধি দমন, ৭) পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, ৮) সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

1.2 GgwWwRÛi mvd‡j¨ evsjv‡`k

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ভাষাতেই এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজি'র 'রোল মডেল'। এ বিষয়ে জাতিসংঘ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যে তথ্য প্রদান করেছে, তা নিম্নরূপঃ[২]

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি নিয়মিতভাবেই ৬ শতাংশের ওপরে রয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এই হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৮ শতাংশ।

২. বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত ভর্তির হার ৯৭.৭ শতাংশ। এর মধ্যে ছেলে ৯৬.৬ শতাংশ ও মেয়ে ৯৮. ৮ শতাংশ। ৫ম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার ১৯৯১ সনের ৪৩ শতাংশ থেকে ২০১৪ সনে ৮১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ১৫ বছরের বেশী বয়সীদের শিক্ষার হার ১৯৯০ সনের ৩৭.২ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

৩. ২০১৪ সনে প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়ের অনুপাত ১০০ ঃ ১০৩, যা ১৯৯০ সনে ছিল ১০০ ঃ ৭৩। আর মাধ্যমিকে ১৯৯০ সনে ছিল ১০০ ঃ ৫২, ২০১৪ সনে ১০০ ঃ ১১৪।

৪. ১৯৯০ সনে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার ছিল হাজারে ১৪৬; ২০১৩ সনে তা ৪৬-এ নেমে এসেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে, ২০১৫ সনে তা ধরা হয়েছিল ৪৮।

৫. ১৯৯০ সনে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ৫৭৪, যা ২০১৩ সনে ১৭০-এ নেমে এসেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত: মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে ১২,২১৭টি কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে।

৬. বাংলাদেশে এইচআইভি অথবা এইড্সের প্রাদুর্ভাব এখনো অনেক কম। ০.১ শতাংশ, যা মহামারী সীমার নীচে।

৭. ১৯৯০ সনে বাংলাদেশে বনাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ছিল ১০ শতাংশ, যা ২০১৪ সনে ১৩.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯০ সনে বস্তিবাসীর হার ছিল ৭.৮ শতাংশ, যা বর্তমানে ৫.২৫ শতাংশে নেমেছে।
৮. ১৯৯০-৯১ সনে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের তুলনায় বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ ছিল ৫.৫৯ শতাংশ; ২০১৩-১৪ সনে তা ১.৭৮-এ নেমে এসেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে দারিদ্র্য নিরসনে যদি এমডিজি স্বার্থক ভূমিকাই পালন করে থাকে তাহলে তার পিঠে আরও কিছু অভীষ্ট মাত্রা জড়িত হয়েছে কেন? এর উত্তরে বলা যায় ১. এমডিজি যদিও দারিদ্র্য নিরসনে কিছুটা কাজে এসেছে কিন্তু এই কার্যক্রম দারিদ্রের মৌলিক কারণগুলো নির্মূল করতে পারেনি এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য ও উন্নয়নের সার্বিক দিকসমূহকে এড়িয়ে গেছে; ২. এমডিজি-র লক্ষ্যগুলো মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে যথেষ্ট নজর দেয়নি; ৩. এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে যতটা কাজে লেগেছে ততটা উন্নত দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। অন্যদিকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ সকল দেশের কার্যক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করবে এই আশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

1.3 ‡UKmB Dbqb Afxómgn

এমডিজি'র উক্ত লক্ষ্যসমূহের অর্জন, সাফল্য ও ব্যর্থতা বিবেচনা করে ২০১৫ সনের আগস্ট মাসে এ্যামেরিকার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ১৯৩টি দেশের সম্মতির ভিত্তিতে প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal-SDG)-তে ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, যা বাস্তবায়নের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১৬-২০৩০। সংক্ষেপে লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপঃ[৩]
১. দারিদ্র্য বিমোচন, ২. ক্ষুধা মুক্তি, ৩. সুস্বাস্থ্য, ৪. মানসম্মত শিক্ষা, ৫. জেন্ডার সমতা, ৬. সুপেয় পানি ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা, ৭. নবায়নযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানী, ৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি, ৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, ১০. বৈষম্য হ্রাস, ১১. টেকসই নগর ও মানব বসতি, ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ, ১৪. সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার, ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার, ১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব।

প্রতিটি অভীষ্টই কোন না কোনভাবে মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত। এইসকল অভীষ্টে পৌঁছতে গেলে যেমন প্রয়োজন বঞ্চিত গোষ্ঠীর অধিকারবোধ, তেমনি জরুরী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার ও কর্তব্যপরায়ণতা। এই দুই অবস্থান থেকে এসডিজি'র বাস্তবায়নকে দেখতে হবে। এসজিডির একটি মৌলিক অঙ্গীকার হচ্ছে "Leaving No One behind" (কাউকে ফেলে না রেখে আসা)। এসডিজি গঠনের আগে যে আলোচনা হয়েছিল তা মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সামাজিক অসমতাকে ঘিরে। এই আলোচনার একটি প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল যে এমডিজি'র আলোকে যে কার্যক্রম সাধিত হয় তা সমস্যার উপরের স্তরকে প্রভাবিত করেছে মাত্র গভীরে গিয়ে নয়। এসডিজি এই গভীর স্তরে গিয়ে সবচাইতে দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে উন্নয়নের জোয়ার পৌঁছিয়ে দেবে এবং এই উন্নয়ন ধারায় যারা পিছিয়ে আছে কিংবা দ্বৈতভাবে (double burden) বৈষম্য ভোগ করছে যেমন আদিবাসী নারী বা প্রতিবন্ধী নারী, তাদেরকে সম্পৃক্ত করবে এবং একইসঙ্গে একই আঙ্গিনায় একই গোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী যখন ভিন্নমাত্রায় ও রূপে উন্নয়নের ফসল ভোগ করবে সেই বৈষম্যরোধও এসডিজি'র কার্যক্রমের অধীনে

পড়বে। সুতরাং এসডিজি যদি কাউকে ফেলে না রেখে আসার প্রতিজ্ঞা দেয় তাহলে এই অভীষ্টসমূহে পৌছুতে হলে যা যা করণীয় তা হচ্ছে ঃ

১. সরকারকে তার নিজ নিজ রাষ্ট্রে সবচাইকে দুর্দশাগ্রস্ত, অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু বিশেষ নীতি (affirmative action) ঘোষণা করা।
২. রাষ্ট্রের মূল তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানকে (Sensus, survey board) এই সকল জনগোষ্ঠী সম্পর্কে গৃহস্থালী পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা যা কিনা জাতীয় নীতিমালা গঠনে কাজে লাগবে।
৩. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল ফোরামে এসডিজি'র মূলমন্ত্র সমুন্নত রেখে কাজ করা।
৪. এসডিজি'র বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ধাপে ধাপে পদক্ষেপ চিহ্নিত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া।
৫. সবচাইতে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর প্রগতির জন্য নির্দিষ্ট মাপকাঠির ইঙ্গিত দেয়া ও তার ভিত্তিতে নিয়মিত রিপোর্টিং করা।

এবার আমরা দেখতে পারি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে বাংলাদেশে বিভিন্ন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর রূপরেখা। যেমন ঃ

ক. ধর্মীয় সংখ্যালঘু : হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান
খ. দলিত গোষ্ঠী : হরিজন, রবিদাস, শব্দকর,কায়পুত্র, ঋষি
গ. আদিবাসী : সাঁওতাল, গারো, মু-া, ওরাওঁ, খাসিয়া
ঘ. মূলত আর্থিক কারণে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী
ঙ. নারী : যেকোন গোষ্ঠী/স্তরের
চ. সংখ্যালঘু নয়, কিন্তু বিশেষ গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত : নিকারী, জোলা, নাগারছি, চৌধালী
ছ. সাংস্কৃতিকভাবে বঞ্চিতগোষ্ঠী : বেদে, হিজড়া
জ. ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘূ : উর্দূভাষী

2. `wjZ Rb‡Mvôx

দলিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে বর্ণিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর এক বিশেষ অংশ। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হরিজন, ঋষি, মুচি, শব্দকর, রবিদাস, কাওড়া, বুনো, কর্তাভজা, ভগবজ্জন, ভগবনিয়া, জেলে, শিকারী, নিকারী প্রভৃতি নামে-উপনামে বসবাসরত রয়েছে দলিত সম্প্রদায়ের লোকজন।[৪]

যে সকল উপগোষ্ঠীর সমন্বয়ে দলিত জনগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে, সেগুলোর নাম স্মরণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এরা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তথ্য অস্পৃশ্যতার প্রত্যক্ষ শিকার। অর্থাৎ দলিত জনগোষ্ঠীকে অধ্যয়ন করার প্রবেশদ্বার হচ্ছে এই বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি| *Social Exclusion in the National Social Protction Strategy (NSSS) for Bangladesh* তাই যথার্থই সামাজিক বিচ্ছিন্নতার আলোকে দলিতদেরকে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে।[৫]

বাংলাদেশে দলিত লোকজনের সরকারি কোন পরিসংখ্যানগত হিসেব নেই যদিও কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এদিকে এগিয়ে আসছে। এটি পরিতাপের বিষয় বটে, ভোটার তালিকায় থাকলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসেবে দলিতদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, যাদের সংখ্যা ৬০-৭০ লাখের মত হতে পারে।[৬] অন্য এক হিসেব মতে, দেশে পঞ্চাশ লাখের মত দলিত লোকজনের বসবাস রয়েছে।[৭] তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে হরিজন ও রবিদাস (১৫ লাখ হরিজন[৮] ও ৮ লাখ রবিদাস[৯] আবার বাংলাপিডিয়ায় এ সংখ্যা ৩.৫ মিলিয়ন উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম জাতিভেদকে অস্বীকার করলেও এই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে পেশার কারণে সমাজে পদদলিত হয়ে রয়েছে, যেমনঃ জোলা, হাজাম, বেদে, বাওয়ালী[১০]। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে, বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর মোট লোকসংখ্যা ৪৩ লাখ ৫৮ হাজার ২৮৯ জন। হরিজন ১২ লাখ ৮৫ হাজার, প্রায় ৯৪ ধরনের দলিত রয়েছে এদেশে।[১১]

সমাজের সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ও কঠোর কাজগুলো এই দলিত জনগোষ্ঠীর লোকজনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক উপবিভাগ রয়েছে; প্রতিটি গোষ্ঠী আবার এক একটি পেশাগোষ্ঠী। যেমন, হরিজন- পরিচ্ছন্ন কর্মী (হরিজনের ভেতর আবার ৮টি উপগোষ্ঠী রয়েছে- যথাঃ হেলা, বাশফোর, ডোম, ডোমার, রাউত, বাল্মিকী, লালবেগী ও হাড়ি), রবিদাস- চামড়া ও জুতা, শব্দকর- বাদ্য-বাজনা, কাওড়া- শূকর পালন, জেলে- মাছ ধরা ও সরবরাহ প্রভৃতি পেশা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে উত্তরাধিকার ভিত্তিক পেশা ও জন্মগত পরিচয়ের কারণে দলিতরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে সরে আসতে পারছে না, যেখানে বিত্তবানরা ইচ্ছামত পেশা পরিবর্তন করতে পারছেন।

3. mvsweawbK I AvBbx A½xKvi

৩.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হয়েছে এবং সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসরদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৬-৪৭ ধারাসমূহে মানুষের নানাবিধ অধিকারের প্রাপ্তির ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। শুরুতে অর্থাৎ ২৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে" এবং ২৬(২)-এ বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ণ করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে[১২]।" পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোয় মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির সার্বিক অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কোন প্রকার ধর্মীয়, বর্ণগত, গোষ্ঠীভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক, জন্মভিত্তিক ইত্যাকার বৈষম্য প্রদর্শন করার কোন সুযোগ নেই।

'The Magna Carta of All Mankind' অভিধায় ভূষিত জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮ (যেখানে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ)-এর প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, "সকল মানুষই (শৃঙ্খলহীন) স্বাধীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী।" আর, দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে, "যেকোন প্রকার পার্থক্য, যেমন জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্মতি, জন্ম বা অন্য

মর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই উল্লিখিত সকল অধিকারের অংশীদার। অধিকন্তু, কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, স্বায়ত্বশাসিত অথবা অন্য যে-কোন প্রকারে সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, সার্বজনীন মানবাধিকারের সুফল লাভে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা চলবে না; তার রাজনৈতিক সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদা যা-ই থাকুক।" [১৩]

আইন, নীতিমালা, অঙ্গীকার- এগুলো অস্তিত্বশীল থাকার পাশপাশি বাস্তবে সমাজে যা হওয়ার তা হয়েও যাচ্ছে। অর্থাৎ, দলিতদের বঞ্চিত হওয়া বা বৈষম্যের শিকার হওয়ার বিষয়ে কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে কি? তা মনে হয় না। স্বয়ং সরকারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। ২০১৩ সনে প্রণীত 'দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা'র পটভূমিতে স্বীকার করা হয়েছেঃ "দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। আবহমানকাল থেকেই এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তারা বৈষম্যের শিকার অথচ সমাজের কতিপয় অপরিহার্য পেশার সংগে তারা সম্পৃক্ত। সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতীয়মান। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্টায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সকলের দায়িত্ব।"[১৪]

৩.২ কাজেই কাগজ-কলমে হিসেব কষে দলিত জনগোষ্ঠীর পরিবর্তন পরিমাপ করলে তা যথাযথ ও ফলপ্রদ হয়ে উঠবে- এমনটি আশা না করাই যুক্তিযুক্ত। সরকারের সাথে সাথে দেশে দলিত ও অপরাপর অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠী নিয়ে যে সকল সুশীল সমাজ বা সেবা সংস্থা আত্মনিয়োজিত রয়েছেন, তাদেরও আত্মসমীক্ষা আবশ্যক বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন নীতিতে দেশের বহু ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জিত হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে দলিত ও অপরাপর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ এসবের অংশীদার হতে পারেনি। ওপরে বর্ণিত 'দলিত জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা ও বৈষম্যের ক্ষেত্র' আলোচনায় আমরা তা অনুধাবন করতে পারি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ড. বিনায়ক সেন ও ডেভিড হিউম পরিচালিত এক গবেষণার প্রতিবেদনে; যাতে বলা হয়, "বাংলাদেশে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এলেও এখনো দেশের একটি অংশ আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে, এরা চরম দরিদ্র। ... দীর্ঘ সময় ধরে এরা চরম দরিদ্র অবস্থানে থেকে যাচ্ছে এবং এদের কোন উত্তরণ ঘটছে না। নিতে হবে 'প্রো-পুওরেষ্ট' বা চরম দারিদ্র্যমুখী কর্মসূচী। ... প্রবৃদ্ধি বাড়লে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে। কিন্তু চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকে যাওয়া মানুষদের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব কাজে দেবে না।"[১৫] উক্ত সমীক্ষার ফলাফলে দেশের ১৫%-১৭% মানুষকে ঐ 'বৃত্তে' আবদ্ধ বলে মন্তব্য করা হয়। দলিত জনগোষ্ঠী যে ঐ বৃত্তের কোষকেন্দ্রে (nucleus) অবস্থান করে, তা নাগরিক উদ্যোগ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের মত বিভিন্ন সংস্থার গবেষণায় উঠে এসেছে।

তবে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পরিচালিত সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন 'দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম'[১৬] -এর আওতায় অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে যদিও এখানে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিষয়টি দুর্বল বলে জানা যায়।

4. `wjZ Rb‡Mvôxi eÂbv I ˆel‡g¨i †ÿÎ t ‡UKmB Dbqb Afxó (GmwWwR)-Gi Av‡jv‡K

দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যের যে রূপ, তার মর্মান্তিক চিত্র ধরা পড়ে বিভিন্ন গবেষণায় ও প্রতিবেদনে । যেমন, নাগরিক উদ্যোগ প্রকাশিত "দলিত নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ উচ্চশিক্ষা, ভূমিঅধিকার ও জীবিকা অর্জনের সুযোগ" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ৫০.৬% দলিত নারীরা বাস করছে খাস জমিতে, এবং ৫০.৪% দলিত ভূমিহীন। এটি মানুষের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে'[১৭] - বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান (সাবেক) - মিজানুর রহমানের এই উক্তির মধ্যেই দেশে দলিতদের অবস্থা চিত্রিত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর লোকজনের আর্থ-সামাজিক জীবন যে অত্যন্ত করুণ, তা নানা প্রতিবেদনে, লেখায়, ফিচারে কিংবা উপাখ্যানে উঠে আসে; মাঝে মাঝেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাদের দুর্বিষহ জীবন যাপন ও বৈষম্যের কাহিনী ।

বাংলাদেশে দলিতদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্রসমূহকে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রার নিরীখে পরখ করলে দেখা যাবে যে, সর্বক্ষেত্রেই দলিতদের অবস্থান নেতিবাচক। বিশেষত, লক্ষ্য নং- ১. দারিদ্র্য বিমোচন, ৩. সুস্বাস্থ্য ৪. মানসম্মত শিক্ষা, ৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি, ১০. বৈষম্য হ্রাস, ১২.সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, ১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব-র সাথে দলিতদের উন্নয়নের সম্পর্ক একেবারেই অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশে বসবাসরত দলিতরা যে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রায় আগ্রাধিকারভিত্তিক উপকারভোগী হওয়ার দাবীদার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৭টি লক্ষ্যের সব ক'টিতেই দলিতদের কথা বিবেচনায় রাখার মত। নিম্নের দু'টি তথ্যসারণী বাংলাদেশের দলিতদের বাস্তব অবস্থার চিত্রায়নে সহায়ক হতে পারে। প্রথমটি নির্দেশ করছে প্রধানত বৈষম্যের স্বরূপ আর দ্বিতীয়টি বঞ্চনার ।

১. ২০১৪ সনের আগস্টে 'দৈনিক প্রথম আলো'-তে একটি প্রতিবেদন[১৮] প্রকাশিত হয়েছিল, যা পরিত্রাণ নামক একটি সেবা সংস্থার স্টাডি থেকে নেওয়া হয়। জীবনধারণের প্রধান ৮টি ক্ষেত্র (১. হোটেল, সেলুন, রেস্তোরাঁ, ধর্মীয় স্থলে প্রবেশাধিকার, ২. ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, ৩. স্থানীয় সরকার, কমিটি, ফোরামে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ, ৪. নির্বাচনকেন্দ্রিক ও অন্যান্য সহিংসতার শিকার, ৫. শিক্ষা, চাকুরী ও চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার, ৬. সরকারি বিভিন্ন সেবা ও তথ্যের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা, ৭. কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার ও ৮. নারীদের অবস্থান) চিহ্নিত করে তাতে দলিত ও অ-দলিত মানুষের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। উল্লিখিত চিত্রে দলিতরা সমাজের কোন স্তরে বসবাস করে এবং কোন চরিত্রের সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্ভব, তা বুঝতে কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের বেগ পেতে হয় না ।

এধরনের বৈষম্য ও বঞ্চনার পাশাপাশি এক ভয়াবহ সামাজিক বাস্তবতা হাতে হাত রেখে তাল মিলিয়ে চলছে;

আর তা হল অত্যাচার ও নির্যাতন। কুষ্টিয়া জেলার দলিত নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থা ফেয়ার এর প্রকাশনা "দলিত জনগোষ্ঠীর অসচেতনা, শিক্ষার অভাব, ও সামাজিক একতা না থাকা ইত্যাদির সুযোগে এলাকার প্রভাবশালী মহল তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে অবৈধ ব্যবসা ও অপরাজনৈতিক কূট-কৌশলের মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে দলিত জনগোষ্ঠীর পাড়া-মহল্লাগুলোতে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করে, প্রভাবশালী মহল কর্তৃক হত্যা, হত্যার হুমকি, অপহরণ, ধর্ষণ, নির্বাচনকালীন সহিংসতার শিকারসহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক দলিতরা হয়রানির শিকার হয়।"[১৯] এই প্রতিবেদনে অনেক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, যা জাতীয় পত্রিকাসমূহে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। হয়ত এজন্যেই মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ১০-১১ অক্টোবর, ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব দলিত সম্মেলনে গৃহীত প্রথম প্রস্তাবেই 'জাতিসঙ্ঘ যেন অবিলম্বে ভারতে ও অন্যত্র দলিতদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে, সেজন্য বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করার' দাবী জানানো হয়।[২০]

5. GmwWR-i Av‡jv‡K wKfv‡e `wjZ‡`i‡K Dbqb bxwZgvjvq wb‡q Avmv †h‡Z cv‡i t mcwikgvjv

এমডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ যে বিশাল সাফল্য দেখিয়েছে, সেটি মাথায় রেখে আমরা চাই এসডিজি বাস্তবায়নেও দেশটি আরও অধিক সফল হোক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এসডিজি'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য। শুধু তাই নয়, সরকার দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) এসডিজি'র কতিপয় লক্ষ্যকে সংযুক্ত করেছে। এসডিজি'র অধিকতর সাফল্যের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদনে পাওয়া দলিতদের যে সুপারিশমালা রয়েছে সেগুলি আমরা এসডিজি'র আলোকে তুলে ধরছি।

এখানে সবচাইতে যে গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট সেটি হচ্ছে ১০ নং অর্থাৎ বৈষম্য হ্রাস। বৈষম্য হ্রাসের পদক্ষেপ নিতে হলে সরকারকে নিম্নের কতগুলি সুপারিশ গ্রহণ করা জরুরী।

- দলিত জনগোষ্ঠীর লোকজনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ উপলব্ধির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ একটি পরিসংখ্যান, যাতে করে সংখ্যাগত, অবস্থানগত ও অন্যান্য সকল বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়।
- জাতীয় সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে 'দলিত জনগোষ্ঠী'-র উল্লেখ করে এদের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট বিবরণ সন্নিবেশিত করতে হবে।
- জাতীয় বাজেটে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচীভিত্তিক বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রস্তাবিত 'বৈষম্য বিলোপ আইন'-এর যথাশীঘ্র বাস্তবায়ন করতে হবে।
- দলিতদের স্ব স্ব সংস্কৃতির বাধাহীন পালন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১ নং অভীষ্ট অনুযায়ী দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যে

- খাসজমি বরাদ্দে দলিতদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৮ নং অভীষ্ট অর্থাৎ কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে দলিত জনগোষ্ঠীর সুপারিশ হচ্ছে

- দলিতদের পেশায় অন্য জনগোষ্ঠীর লোকজনের অনুপ্রবেশে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।
- পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশনে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নকর্মীদের যথাযথ নিয়োগপত্র প্রদান করতে হবে।
- পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশনে ও স্থানীয় হাট-বাজারে বসে কাজ করে এমন জুতা শ্রমিকদের জন্য স্থান নির্ধারণ করে শেড নির্মাণ করে দিতে হবে।
- পরিচ্ছন্ন কর্মী, চা শ্রমিক ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের সম্মানজনক বেতন কাঠামো ঘোষণা করতে হবে।
- কাওরা সম্প্রদায়ের লোকজন যাতে নির্বিঘ্নে ও ভয়-ভীতিহীনভাবে তাদের বুনিয়াদী পেশা শূকর পালন করতে পারে. তা নিশ্চিত করতে হবে।
- জলাভূমি তথা বিল, বাওড় ও হাওড়ের বরাদ্দ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৪ নং অভীষ্ট মানসম্মত শিক্ষা ও ৩ নং অভীষ্ট সুস্বাস্থ্য পুরণ করার লক্ষ্যে দলিত জনগোষ্ঠীর সুপারিশ নিম্নরূপ:

- সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থাপনাসমূহ তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, খাবারের দোকান ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানে দলিতদের প্রবেশাধিকার অবারিত করতে হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সকল প্রোগ্রামে দলিতদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য- এই দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে দলিতদের পাড়ায়/ মহল্লায় বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আশু ব্যবস্থা নিতে হবে।

GmwWwRÕi 5 bs Afx‡ó †RÛvi mgZv

- দলিত নারীদের জন্য পৃথক ও বিশেষ উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শান্তি ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এসজিডি অভীষ্ঠ ১৬ নম্বর যেখানে দলিত জনগোষ্ঠীর সুপারিশমালা রয়েছে নিম্নরূপ :

- বৈষম্য ও হিংসার ঘটনাসমূহ তথা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়সমূহকে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ায় আনতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি লোকজনকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত ও সচেতন করে তুলতে হবে।
- জাতীয় দলিত কমিশন প্রতিষ্ঠাকরণ।
- তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে দলিত জনগোষ্ঠীর লোকজনকে পারদর্শী করে তুলতে হবে। শুধু দলিত কেন, যেকোন ধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার অর্জন সাপেক্ষে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই আইনটির কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ড. শামসুল বারী তাই বলেন,"…the marginalised communities of the country, who were introduced to RTI by NGOs, have both benefitted from and contributed to establishing a transparent delivery system of the government's safety net programmes through their persistent use of the law. There can be no better example of RTI helping the realisation of SDG objectives of ending poverty, hunger and discrimination." [২১]

6. Dcmsnvi

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ও যুক্তিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাই পরিশেষে বলতে চাই- একমাত্র **wÎcÿxq mgšqB** পারে দলিতদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনমানের নিশ্চয়তা প্রদান করতে, যেখানে বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক আদর্শে মানুষের পরিচয় হবে কেবলই 'মানুষ'।

১ম পক্ষ- সরকার: নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বরাদ্দ প্রদান, নিরবচ্ছিন্ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের চিন্তা ও কর্মকে সংযুক্ত করণ।

২য় পক্ষ- সেবা সংস্থা: সাংগঠনিক ও যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধানের রূপরেখা তৈরী করা।

৩য় পক্ষ- দলিত জনগোষ্ঠী: গণগবেষণা পদ্ধতিতে দৃশ্যমান সমস্যা দূরীকরণে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যা একেবারেই নিজেদের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য (যেমন- শিক্ষা গ্রহণ); এভাবে শুরু করতে পারলে ধীরে ধীরে অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় অনুসন্ধানের মানসিক প্রেরণা সৃষ্টি হবে ।

আমরা মনে করি- তিন পক্ষ একযোগে কাজ করলে এসডিজি ১৭ নম্বর অভীষ্টে আমরা পৌঁছতে পারব যেখানে বলা হয়েছে টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বের কথা । তাহলে দলিত জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ত্বরিৎ ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্বিকভাবে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত হবে ।

Z_¨mÎ

1. http://machizo.com/newsandblog/mdgsbangla/
2. http://www.dw.com/bn/এমডিজি থেকে এসডিজি- প্রেক্ষাপট-বাংলাদেশ/a-19115
3. উইকিপিডিয়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
4. সুরাইয়া বেগম, "বাংলাদেশের সমাজ বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী, "সমাজ নিরীক্ষণ" নং ১০৮, ২০০৭, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা
5. Policy Brief, Social Exclusion in the National Social Protction Strategy (NSSS) for Bangladesh, Manusher Jonno Foundation
6. প্রথম আলো, ২১-১১-২০১১
7. দৈনিক সমকাল, ২০-১০-২০১৪
8. প্রথম আলো, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৪-০৮-২০১৪
9. সাপ্তাহিক পাতাকুঁড়ির দেশ, ০৪-০৬-২০১৭
10. বাংলাপিডিয়া, দলিত সম্প্রদায়
11. দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৩-১৪, ফেয়ার, কুষ্টিয়া, পৃ: ২৫
12. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধান
13. জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র
14. দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা', সমাজসেবা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৩
15. ড. বিনায়ক সেন (বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ) ও ডেভিড হিউম (ক্রোনিক পোভার্টি রিসার্চ সেন্টার, ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেষ্টার, ইউ.কে.)-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য ঃ আরোহন, অবতরণ, প্রান্তিকতা ও অব্যাহত থাকা' শীর্ষক প্রতিবেদন। সূত্র ঃ প্রথম আলো, অক্টোবর ০৯, ২০০৬, পৃ. ১
16. দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা', সমাজসেবা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৩
17. দৈনিক প্রথম আলো, ১৪-০৮-২০১৪
18. দৈনিক প্রথম আলো, প্রাগুক্ত
19. দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৩-১৪, ফেয়ার, কুষ্টিয়া, পৃ: ৩৩
20. দেবী চ্যাটার্জী, মানবাধিকার ও দলিত, কোলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৪, পৃ: ১২০
21. Shamsul Bari & Ruhi Naz, Putting people at the heart of development, The Daily Star, September 15, 2017

---

*"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আলোকে বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান" শীর্ষক নাগরিক সংলাপে উপস্থাপিত মূল প্রতিবেদন, ১২ নভেম্বর ২০১৭, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা।